চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবত তওহীদের প্রস্তাবনা

মসীহ উর রহমান
আমীর হেযবুত তওহীদ

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব, বস্তুসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একে অন্যের সাথে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে পারে। এই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্যই মানুষের একটি জীবনব্যবস্থা অপরিহার্য। এই জীবনব্যবস্থা আবার হতে হবে শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced)। এমন ভারসাম্যপূর্ণ, নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত জীবনব্যবস্থা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেনও। এরপরও মানুষ তার জীবন চালানোর জন্য নিজের ইচ্ছা মতো জীবনব্যবস্থা রচনা করেছে, যা ভারসাম্যহীন, ত্রুটিযুক্ত। এই জীবনব্যবস্থাগুলি গত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে, কিন্তু এগুলি মানুষকে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, উন্নতি, প্রগতি, ঐক্য, শৃঙ্খলা-এক কথায় সুখ ও শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল দেশে বহুদিন ধরে চরম অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, আন্দোলন, ভাঙচুর, হরতাল, জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি হচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই প্রায় একই দৃশ্য। আমাদের দেশেও প্রায় সারা বছর চলে সরকার আর বিরোধীদলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পারস্পরিক দোষারোপ, সরকার পতনের আন্দোলন, হরতাল, ঘেরাও, বিক্ষোভ, জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন। পাঁচ বছর পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে। নতুন দল ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের মতই দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজি, অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার করতে থাকে। এভাবে একের পর এক সরকার পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে না। চলমান এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখে দেখে মানুষ হতাশ। কিন্তু তাদের কাছে কোন উত্তম বিকল্প না থাকাতেই একবার কড়াই থেকে চুলায় লাফিয়ে পড়ছে, আবার বাঁচার জন্য লাফিয়ে কড়াইতে উঠছে।

এমন পরিস্থিতি থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য মহান আল্লাহ একটি পথ প্রদান করেছেন। এ পথটি কতটুকু ফলপ্রসূ তা বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ইসলাম-পূর্ব আরবের দিকে। তখন আরবের লোকেরা বংশধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো গোত্রপতিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক। এই সব গোত্রগুলির মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধেই থাকতো, যা পুরুষাণুক্রমে অব্যাহত থাকতো। তারা ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অবজ্ঞাত, ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব বেদুইন হিসাবে পরিচিত। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত এই মানুষগুলিই যখন আল্লাহর রসুলের আনীত জীবনব্যবস্থাটি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করল, তখন তারা হয়ে গেল বিশ্বজয়ী একটি জাতি। প্রায় নিরক্ষর আরবদের থেকে এমন একটি জাতির উন্মেষ ঘোটল যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হল। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন মানুষগুলো ভাই হয়ে গেল। চুরি, ডাকাতি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য দূর হয়ে সমাজে সমৃদ্ধি আসলো। আজ আমরা রসুলাল্লাহর যে সাহাবীদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে জানি, তাঁরা ইসলাম গ্রহণের আগেও কি এমনই ছিলেন? না। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরাই একেকজন অনুসরণযোগ্য মহামানবে পরিণত হলেন। আজও আমরা তাদের নামের পরে বোলি 'রাদি আল্লাহু আনহুম' অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি, খুশি।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটেও আমাদেরকে সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে আল্লাহর দেওয়া সেই অপরূপ, নিখুঁত সিস্টেমটি। স্রষ্টার প্রদত্ত সেই সিস্টেমকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে মানবজাতি একদিকে যেমন চরম অন্যায় ও অশান্তির আগুনে পুড়ছে, অপরদিকে আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফের ও মোশরেক হওয়ার ফলে পরকালেও অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। তাই মানবজাতির প্রতি আমাদের প্রস্তাব- আসুন, আমরা যদি সত্যিই শান্তিতে

নিরাপত্তায় জীবনযাপন করতে চাই তাহলে বার বার সরকার পাল্টানোর চিন্তা না করে চলমান সিস্টেমটাই পাল্টাই। আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই পারে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অপরাধের দুয়ার বন্ধ করে দিতে। সেই জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর নাজেল করেছেন। সময়ের বিবর্তনে সেই সত্যদীনের প্রকৃত রূপটি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সত্যময় জীবন ব্যবস্থার রূপ কেমন হবে সেটি আবার মহান আল্লাহ এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে দান করেছেন যেটি বাস্তবায়নের ফলে আজকের ঘুণে ধরা সমাজের অসৎ মানুষগুলিই একেকজন সোনার মানুষে পরিণত হবে এনশা'ল্লাহ। আসুন, আমাদের মধ্যে বিরাজমান সকল মতভেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, দলাদলি, হিংসা, কলহ, শত্রট্টতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে একটা কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ হই যে, আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কারও হুকুম মানব না।

আমাদের প্রস্তাবনা মেনে নিলে কি হবে?

১. জাতীয় বৈশিষ্ট্যঃ পরস্পর ঐক্যহীন, দ্বন্দ্ব বিবাদে লিপ্ত, শতধাবিচ্ছিন্ন এই জাতিটি সীসা গলানো প্রাচীরের ন্যায় একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে। যে জাতিটি বর্তমানে কোনরূপ নিয়ম শৃঙ্খলার তোয়াক্কা করে না, তারাই এমন একটি সমাজ গঠন করবে যেখানে সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। প্রায় সকল দিক থেকে পশ্চাদপদ এই জাতিটি শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পৃথিবীর শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

২. নেতৃত্বঃ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছেন যিনি ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে (তাকওয়া) শ্রেষ্ঠ। নেতৃত্ব পাওয়ার আশায় কেউ প্রার্থী হওয়া তো দূরের কথা ইশারা ইঙ্গিতেও এই অভিপ্রায় প্রকাশ পেলে তিনি প্রাথমিকভাবেই অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কর্তৃপক্ষ জনগণের সাথে পরামর্শ করে, নির্লোভ, আমানতদার, ওয়াদা রক্ষাকারী, মানবকল্যাণে উৎসর্গিতপ্রাণ ব্যক্তি যাকেই যোগ্য মনে করবে তাকে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জাতির নেতৃত্বে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নেতা হিসাবে নির্বাচিত হবেন। নেতা একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে সেই নেতার হুকুম জাতির সকলে সম্মিলিতভাবে, দ্বিধাহীনভাবে, প্রশ্নহীনভাবে, শর্তহীনভাবে, জান দিয়ে হলেও সেই আদেশ বাস্তবায়িত করবে। নেতা এবং জনগণ কেউই কোন কাজকে ছোট মনে করবেন না। ছোট বড় যে কাজই কাউকে দেওয়া হোক তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে বলেই সে বিশ্বাস করবে এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

নেতৃত্ব থেকে বহিস্কৃত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম অযোগ্যতাই হবে, নেতা যদি নিজেই নিজের প্রশংসা প্রচারকারী হয়। সমাজের কেউ কারও পেছনে সমালোচনা করবে না, কেউ কাউকে কোন অপবাদ দেবে না। কারও ভুল ত্রুটি থাকলে সেটা মানুষ তার সামনেই বলবে, সত্য বলার এমন বাকস্বাধীনতা সৃষ্টি হবে যে, যে কোন মানুষ প্রকাশ্যে শাসক থেকে শুরু করে সাধারণ যে কারোর ভুল-ত্রুটি ধরতে পারবে। জাতির সর্বোচ্চ নেতা থেকে সকল স্তরের নেতারাই জাতির যে কোন মানুষের করা যে কোন অভিযোগের জবাবদিহি করবেন। খলিফা ওমরকে (রাঃ) জুম'আর দিন খোতবা থামিয়ে এক যুবকের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছিল, এ ইতিহাস সকলেরই জানা। আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম গ্রহণ মানবজাতিকে এমন নেতৃত্ব উপহার দেবে যাদেরকে তাদের জনগণ ভালোবাসবে, ঘৃণা করবে না। নেতাদের জন্য দেহরক্ষীর প্রয়োজন হবে না।

শাসকরা থাকবেন জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর বিধানমতে দুইজন ব্যক্তির মধ্যেও একজন থাকবেন দায়িত্বশীল বা আমীর। সুতরাং কোন একজন ব্যক্তিও কখনও নিজেকে অবহেলিত বা উপেক্ষিত ভাবতে পারবে না। সর্বদাই তার একজন দায়িত্বশীল থাকবেন যিনি নেতৃত্বের ক্রমধারা (Chain of command) অনুযায়ী

জাতির প্রধান পরিচালকের (এমাম) নিয়ন্ত্রণাধীন। শাসক হিসাবে তারা একজন নাগরিকের চেয়ে বাড়তি কোন সুবিধাই ভোগ করবেন না। তাদের জীবনযাপন হবে সাধারণ মানুষেরই মত, তাই সাধারণ মানুষের সুবিধা অসুবিধা বুঝতে তাদের কোনই অসুবিধা হবে না। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার প্রশিক্ষণ হল সালাহ। শরিয়াহর নিয়ম হল সালাতের (নামাজের) এমামতি তিনিই করবেন যিনি আল্লাহ ও রসুলের হুকুম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং মুসুল্লিগণ কর্তৃক এমামতি করার জন্য সম্মতিপ্রাপ্ত। একইভাবে কারও সম্পর্কে জনগণের অসম্মতি থাকলে তিনি আর তাদের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখবেন না, আপাতদৃষ্টিতে তিনি যত বড় জ্ঞানী বা যোগ্য ব্যক্তিই হোন না কেন। সুতরাং শাসকের স্বৈরাচারী হওয়ার কোন সুযোগই থাকবে না। জনগণের সম্মতিহীন নেতা কোনদিন জাতির নেতৃত্বের আসনে বসতে না পারার ব্যাপারে ইসলামের নিকট কোন তন্ত্রই আসতে পারে না।

আল্লাহর ব্যবস্থা দিয়ে মানবজাতিকে শাসন করাই মানুষের প্রকৃত এবাদত, এজন্য শাসকগণ হবেন আল্লাহর সবচেয়ে বড় এবাদতকারী। তারা জনগণকে ভালোবাসবেন, জনগণও তাদের শাসকদেরকে ভালবাসবে। রাষ্ট্রের সম্পদকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করবেন না, একে তারা জনগণের পবিত্র আমানত হিসাবে রক্ষা করবেন। তারা নিজেদের পরিবার ও অযোগ্য আত্মীয়স্বজনকে এনে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পুঞ্জীভূত করবেন না।

৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: এমনভাবে উন্নত হবে যে, অর্থ এক জায়গায় পুঞ্জীভূত থাকবে না, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এক বালতি পানি মাটিতে (পৃথিবীতে) ঢেলে দিলে ঐ পানি চারদিকে ছড়িয়ে যায় এবং স্বাভাবিক নিয়মেই যেখানে গর্ত (দারিদ্র্য) থাকে সেটা ভরে দেয়, যেখানে উঁচু (সমৃদ্ধি) থাকবে সেখানে যাবে না এবং ঐ পানি নিজে থেকেই তার সমতল খুঁজে নেয়। এভাবে সম্পদ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিশীলতার মাধ্যমে গোটা জাতিকে সমৃদ্ধ করবে। এভাবে এমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে যে, যাকাত ফেতরা নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। সুদের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে কোন দরিদ্র কৃষকের আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হবে না।

৪. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: যত খুশী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যাবে, এ ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না, বিধিবিধানের জটিলতার জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে হবে না। কেবল একটি মাত্র শর্ত থাকবে, গণমাধ্যমের দ্বারা কারো চরিত্র হনন করা বা কোনরূপ মিথ্যা প্রচার করা যাবে না।

৫. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা: আল্লাহর সত্যদীন গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে সমাজে ন্যায়, সুবিচার এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে সমাজে, রাষ্ট্রে তথা সমস্ত বিশ্বে অন্যায়, অপরাধ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। প্রত্যেকেই যার যার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না, জান-মালের ক্ষতি করার চিন্তা করবে না। এজন্য আইন-শঙ্খলা রক্ষার জন্য রাস্তায়-রাস্তায় অস্ত্র নিয়ে পাহারার প্রয়োজন হবে না। কেউ রীপুর বশবর্তী হয়ে কোন অপরাধ করে ফেললে এমন অনুতাপে দগ্ধ হবে যে নিজেই প্রাপ্য শাস্তি গ্রহণ করে পাপমুক্ত হয়ে পরকালের শাস্তি থেকে নিস্তার আশা করবে। ভাই যেমন আরেক ভাইয়ের ক্ষতি হতে দেখলে সেটার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে, তেমনি সমাজের সবাই সবাইকে নিরাপত্তা দেবে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন উন্নত হবে যে, গায়ে স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত অবস্থায় একজন যুবতী নারী রাতের অন্ধকারে শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে, আল্লাহ ও বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুর ভীতি তার মনে জাগ্রত হবে না। স্বর্ণের দোকান খুলে রেখে মানুষ চলে যাবে, কেউ চুরি করার চিন্তাও করবে না। রাস্তায় যত মহামূল্যবান সম্পদই পড়ে থাকুক কেউ ধরে দেখবে না। মানুষ রাতে ঘরের দরজা লাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না।

৬. বিবাহ ব্যবস্থা: বিয়ের সময় যে শব্দটি ব্যবহার হয় তাহল আক্দ যার অর্থ গ্রন্থি, গিঁট বা গেরো (Knot)। দু'টি মানুষকে (নারী ও পুরুষ) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে গঠিত হয় একটি পরিবার, এভাবে

ক্রমান্বয়ে গঠিত হয় ঐক্যবদ্ধ সমাজ, ঐক্যবদ্ধ এক বিশ্বসম্প্রদায়। অর্থাৎ শেষ জীবন ব্যবস্থায় স্রষ্টার অভিপ্রায় হল পুরো মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, যার প্রথম পদক্ষেপ হল বিয়ে ব্যবস্থা। এজন্যই ইসলামে বিয়ে ব্যবস্থাকে সবচাইতে সহজ করা হয়েছে। প্রতিটি বিয়েতে বর ও কনের পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে, বর তার সামর্থ্যানুযায়ী দেনমোহর প্রস্তাব করবে, কনে তাতে স্বীকৃত হলে সাক্ষীদের সম্মুখে বিয়ে হবে। বর তার দেনমোহর পরিশোধ করার পর স্ত্রী তার জন্য বৈধ হবে। এখানে যৌতুকের কোনো সুযোগই থাকবে না, ফলে নির্যাতন নিপীড়নের বড় একটি ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যাবে। বর্তমানে এই ব্যবস্থার মধ্যেও ভারসাম্য বিনষ্ট করা হয়েছে, একদিকে মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক স্থানে এমন অকল্পনীয় দাম হাঁকা হয় যা থেকে তাদের পক্ষে বিয়ে করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে নারীদের কোনো মূল্যই রাখা হয় নি, সেখানে মোহরানার পরিবর্তে যৌতুক দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বিনষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃত ইসলামের সংস্কৃতি অনুসারে বিয়ে করতে কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ অর্থ প্রদান করতে হবে না। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে না, বাবা যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পারার কারণে নববধুর হাতের মেহেদী রং মুছে যাওয়ার আগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পোড়তে হবে না।

৭. কর্মসংস্থানঃ পৃথিবী আল্লাহর। বনী আদমকে তিনি এই পৃথিবীর মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই মাটির উপর মানুষের সৃষ্টিগত অধিকার। এই পৃথিবীর সর্বত্র তার ফসল ফলানোর, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার অধিকার, যাতায়াতের অধিকার, সর্বত্র বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছেন আল্লাহ। কারও অধিকার নেই মানুষকে কোনো আইন-কানুনের বেড়াজালে আটকে তার এই সব অধিকারকে খর্ব করার। আল্লাহর দেওয়া এই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হলে তাই পৃথিবীতে মানুষের কোনো কর্মসংস্থানের অভাব হবে না। সে সমাজে সকল কর্মক্ষম মানুষই কর্মসংস্থান পায়, সে সমাজের সমৃদ্ধি আপনা আপনি আসে। যাকাত ছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে দানের ব্যাপারে ইসলামে এত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে, মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য বহুলাংশে দূর হয়ে যাবে। এমন সমাজে অক্ষম-অসুস্থ মানুষও আর্থিক সমস্যায় পড়বে না, না খেয়ে থাকা তো দূরের কথা।

৮. সকল ধর্মের সম্প্রীতিঃ বিশ্বধর্মগুলিসহ আরও যে ধর্মগুলি মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে সেগুলির অধিকাংশই ইসলামেরই আদিরূপ। বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহই এ ধর্মগুলি নাজেল করেছিলেন তাঁর নবী-রসুলদের উপরে। সেগুলি কালক্রমে মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত হয়ে গেলেও বংশানুক্রমে আজও সেগুলি পালিত হয়ে আসছে। গৌতম বুদ্ধ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর, যরোথুস্ত্র, যুধিষ্ঠির, সক্রেটিস প্রভৃতি সকলেই ছিলেন আল্লাহর নবী-রসুল। অতীতের বহু নবী-রসুলকেই আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকরা দার্শনিক (Philosopher) বলে আখ্যায়িত করেন। যামানার এমাম সেই সব মহাপুরুষদের মধ্যে যারা প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরীত পুরুষ, অবতার, নবী, রসুল ছিলেন তাদেরকে স্বীকৃতি ও যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য ধর্মের নবীদেরকে যখন আল্লাহর প্রেরীত বলে মেনে নেওয়া হবে তখন স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক হানাহানি বিলুপ্ত হবে, ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি অভূতপূর্ব নিদর্শন স্থাপিত হবে পৃথিবীতে। আল্লাহর সত্যদীন যখন অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সম্প্রীতি ও পরধর্মসহিষ্ণুতার যে স্বাক্ষর আসহাবে রসুল রেখে গেছেন তা আজও অতুলনীয়। জিশুর (আঃ) মূর্তির নাক ছেদনকারীকে ধরতে না পেরে মিশরবিজয়ী সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রাঃ) নিজের নাক পেতে দিয়েছিলেন বিশপের তলোয়ারের নিচে। আর খলিফা ওমর গির্জার অধ্যক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও গির্জার অভ্যন্তরে সালাহ কায়েম করেন নি, কারণ হয়তো এই অসিলায় ভবিষ্যতে গির্জাকে হয়তো মসজিদে পরিণত করে ফেলা হবে। ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের এমন সুরক্ষা একমাত্র প্রকৃত ইসলাম ছাড়া মানব ইতিহাসে আর কেউ দিতে পারে নি, পারবেও না। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ কারও ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনে বাধ্য করবে না, কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কথা বলবে না।

৯. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদঃ প্রকৃতির উপর অত্যাচার করে করে মানুষ পৃথিবীর পরিবেশকে কেবল ভারসাম্যহীনই নয়, একেবারে বসবাসের অযোগ্য করে ফেলেছে, অসংখ্য জীব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার রূপ, রং, রস হারিয়ে ফেলেছে। এর পেছনে প্রধান কারণ হল, পৃথিবীর বুকের উপর মনগড়া সীমারেখা টেনে অল্প পরিসীমায় মাত্রাতিরিক্ত মানুষকে আটকে রাখা। এই অন্যায়ের অবসান হলে প্রকৃতির উপরে যথেচ্ছাচার বন্ধ হবে, পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষা করে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হবে না। মানুষ প্রকৃতির উপর অত্যাচার বন্ধ করলেই সে তার আসল রূপ ফিরে পাবে। বন, নদী, খাল, বিল, পশু, পাখি, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি কোনো বিশেষ শ্রেণীর বা নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের কুক্ষিগত থাকবে না, কারণ এগুলি মানবজাতির সম্পদ, এর উপর সবার সমান অধিকার। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যে সর্বত্র স্বাস্থ্যসম্মত, দূষণমুক্ত, নির্মল পরিবেশ বিরাজ করবে, গণস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন কোনো কিছু থাকবে না। এরপরও কোনো কারণে অসুখ-বিসুখ হলে প্রাকৃতিক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াহীন নির্ভেজাল প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে। ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছ-গাছালি, খাবারদাবার সহজলভ্য হবে। চিকিৎসক এমনভাবে আত্মিকগুণে গুণান্বিত হবেন যে, চিকিৎসাকে তিনি এবাদত মনে করবেন, রোগী চিকিৎসা কেন্দ্রে গেলে এমনিতেই নিজেকে সুস্থ মনে করবে।

১০. নারীদের অবস্থানঃ একটা জাতির প্রায় অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ। কাজেই প্রায় অর্ধেক জনশক্তি নারীকে অন্তর্মুখী করে রেখে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। নারীরা মহানবীর (দঃ) সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন, শত্রুদের হামলা করেছেন, আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন, নিহতদের দাফনে সহায়তা করেছেন, যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা করেছেন। তারা মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে, জুম'আর সালাতে, দুই ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতেন। প্রকৃত ইসলামের জুমা কিন্তু বর্তমানের মত মৃত জুমা নয়, সেই জুমা ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের অংশ। তারা পুরুষের সঙ্গেই হজ্ব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, যেটা এখনও চালু আছে; তারা কৃষিকাজে, শিল্পকার্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা কখনই পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। সুতরাং আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হলে নারীরা পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অঙ্গন থেকে শুরু করে জাতীয় অঙ্গনে ভূমিকা রাখবেন।

১১. সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাঃ আল্লাহ প্রদত্ত শেষ জীবনব্যবস্থা যেহেতু সমগ্র মানবজাতির জন্য সেহেতু এতে নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক, সংস্কৃতি সম্ভব নয়। কাজেই যার যার খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক ইত্যাদি অনুশীলন করবে, কোনো নির্দিষ্ট ধরনের সংস্কৃতি, পোশাক বা খাদ্যাভ্যাস কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু অশ-ীলতাকে কোনো ধর্মে, কোন সমাজেই গ্রহণ করে না, তাই সকল প্রকার অশ-ীলতা পরিত্যাজ্য। সুরের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ, কাজেই মানুষের প্রতিভা বিকাশ এবং চিত্তানন্দের নিমিত্তে অশ্লীলতামুক্ত ও স্রষ্টার অবাধ্যতামুক্ত যত খুশি সুর, সঙ্গীত, কাব্যচর্চা, চলচ্চিত্র, নাট্যচর্চা প্রভৃতি করা যাবে।

১২. বিচারব্যবস্থাঃ বিচারকের কলম হবে আল্লাহর কলম, যেহেতু বিচারক আল্লাহর হুকুমের বাইরে কিছুই করবেন না, বিচারকের সিদ্ধান্ত হবে আল্লাহর সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ নির্ভুল; কাজেই এমন ন্যায়বিচার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, বিচারের রায়ে বাদী-বিবাদী উভয়ই সন্তুষ্ট থাকবে। এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে, বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের, শক্তিমান-দুর্বলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার কোন সুযোগ থাকবে না। বিচার চাইতে গিয়ে ঘাটে ঘাটে অর্থ ব্যয় করে কাউকে অপদস্থ ও নিঃস্ব হতে হবে না।

১৩. বাণিজ্যখাতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজারব্যবস্থা উন্মুক্ত ও অবাধ হবে, ব্যবসায়িক অনুমতির জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হবে না, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যখানে সুবিধাবাদী কোন শ্রেণীই থাকবে না। ওজনে কম দেওয়া, মানুষকে ঠকানো এবং ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট ও মজুদদারীর কথা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না।

১৪. ধর্মব্যবসাঃ ধর্ম এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য, কাজেই কেউ ধর্মকে ব্যবসার মাধ্যম বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ধর্মের যাবতীয় কাজ হবে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও মানবতার কল্যাণে।

১৫. শ্রম ব্যবস্থাপনাঃ জোরপূর্বক শ্রম আদায়ের কোন সুযোগ থাকবে না। মনে রাখতে হবে জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই হল দাসত্ব, এটা জাহেলিয়াত, এটা ইসলাম চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষ স্বীয় যোগ্যতা, দক্ষতা ও মর্যাদা অনুযায়ী শ্রম দেবে। এটা সে দেবে আত্মিকভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে, দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে সেবার মানসিকতা নিয়ে। সেবা প্রদানে ও সুবিধা গ্রহণে দাতা-গ্রহীতা উভয় পরিতুষ্ট থাকবে। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই সে তার প্রাপ্য মজুরি পেয়ে যাবে, ন্যায্য টাকা ও অধিকারের জন্য কাউকে আন্দোলন করতে হবে না। সবাই তার মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা অনুযায়ী প্রতি অঙ্গনে তার উপরস্থকে আত্মা থেকে আন্তরিকতা সহকারে সেবা দান করবে।

১৬. শিক্ষাখাতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে মানবতার কল্যাণ। আত্মিক, চারিত্রিক ও জাগতিক জ্ঞানের সমন্বয়ে এমন শিক্ষাব্যবস্থা হবে যেখানে শিক্ষক হবেন মানবতাবাদী, মহৎ, সত্যনিষ্ঠ মহান আদর্শের প্রতীক। তিনি শিক্ষাদানকে মানবজাতির প্রতি নিজের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা (Duty and Responsibility) বলে এবং সকল জ্ঞানকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত বলে মনে করবেন। শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা হবে না, এতে থাকবে ধনী-নির্ধন সকলের অধিকার। তাই শিক্ষার্জন করতে গিয়ে কাড়ি কাড়ি অর্থ খরচের প্রয়োজন হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যা অর্জন করে কেউ দুর্নীতিবাজ হবে না, স্বার্থের জন্য দেশ বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করবে না। তারা হবে সুশিক্ষিত, নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান সমাজের এক একটি আলোকবর্তিকা। তারা মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে, মানবতার ক্ষতি হয় এমন কাজ তারা চিন্তাও করবে না। ছাত্রের কাছে একজন শিক্ষক হবেন শ্রদ্ধায় দেবতুল্য এবং ছাত্ররাও হবে শিক্ষকের আত্মার সন্তান। মানবজাতির মহান শিক্ষক নবী করিম (দঃ) এর সামনে বসে নারী-পুরুষ উভয়ই শিক্ষা অর্জন করতেন, কাজেই প্রকৃত ইসলামেও নারী-পুরুষ উভয়ই শিক্ষকের সামনে বসে শিক্ষা অর্জন করবেন (Co-education System)।

১৭. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাঃ স্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ যে কোন জিনিস নিয়ে গবেষণা করা যাবে কিন্তু মানুষের ক্ষতি হয় এমন কিছু করা যাবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজাতির সম্পদ, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির সম্পদ নয়। প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাবে, কেবল অপব্যবহার থাকবে না, কোন কিছুই মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার হতে দেওয়া হবে না।

১৮. নৈতিক অবস্থাঃ মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত কেবল দেহসর্বস্ব, ভোগসর্বস্ব প্রাণী নয়। তার ভিতরে আছে আল্লাহর রূহ, আল্লাহর আত্মা, এজন্য মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। যখন আল্লাহর ইসলাম অর্ধ-পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের প্রতিটি মানুষ আল্লাহকে ভয় পেত। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, পরোপকার, মেহমানদারি, উদারতা, ত্যাগ, দানশীলতা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মানুষের চরিত্র পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিমদের ওয়াদার মূল্য ছিল তাদের জীবনের চেয়েও বেশী। এটা হয়েছিল আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমের কারণে। কেননা আল্লাহর সিস্টেম কেবল মানবসমাজের বাহিরের দিকগুলি (অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, প্রশাসন ইত্যাদি) নিয়েই কাজ করে না, এটি মানুষের চরিত্রকেও গড়ে তোলে আল্লাহর গুণাবলীর আলোকে। ফলে প্রতিটি মানুষ হয়ে যায় সত্যের প্রতিমূর্তি। তাই সে

সমাজে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করবে না, অন্যের সম্পদে হাত দিতে প্রভুর ভয়ে তারা তটস্থ থাকবে।

কেউ মনে করতে পারেন, এই রকম সমাজ ও রাষ্ট্র কেবল কল্পনাই করা সম্ভব, বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, এমন সমাজব্যবস্থাই ১৪০০ বছর আগে অর্ধ-পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে। সেই জীবনব্যবস্থা আবার আল্লাহ দান করেছেন। মনে রাখতে হবে, বর্তমানে মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ, খানকায়, স্কুলে, কলেজে যে ইসলামটা চলছে আমরা সে ইসলামের কথা বলছি না। আমরা বলছি আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত ইসলামের কথা, যে জীবনব্যবস্থা, দীন একটি জাতিকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রগতির সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দেবে। এখন মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা সেই জীবনব্যবস্থাটি গ্রহণ করবে তাহলেই উপরোক্ত শান্তি, ন্যায়বিচার, জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা সমাজে ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু মানুষ যদি এই অন্যায়-অশান্তিপূর্ণ সমাজকে ভালোবেসেই হোক আর ঘৃণা করেই হোক আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় সেটার ফলভোগ তাদেরই করতে হবে। পৃথিবীতে তারা তাদের নিজের জ্বালানো আগুনে পুড়ে মোরবে, ওপারেও পুড়ে মরবে জাহান্নামের আগুনে।